ইরার মা অফিসের কাজে কক্সবাজার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ইরার জন্য একটা ঝিনুকের মালা নিয়ে এসেছেন। ইরা বন্ধুদের মালাটা দেখাতে নিয়ে এলো।

কি সুন্দর না মালাটা! ঝিনুক দিয়ে মালা হয় এটা আমি জানতাম না, বলল আগুন।

অবনী বলল ঝিনুক দিয়ে মালা ছাড়া আরও অনেক কিছু হয়। ঝিনুকশিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় কুটিরশিল্প। সমুদ্র সৈকত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শামুক ঝিনুক দিয়ে ঘর সাজানোর কত কিছু যে তৈরি করা যায়! আবার বিভিন্ন প্রকার ঝিনুকের ভেতর মুক্তা পাওয়া যায়। মুক্তা দিয়েও অনেক রকমের গয়না তৈরি হয়। মুক্তা আহরণের জন্য অনেক জায়গায় ঝিনুকের চাষও হয়ে থাকে। সমুদ্র হল অপার বিস্ময় আর সম্ভাবনার মিলিত রূপ।

সমীর বলল- আমি কখনও সমুদ্রে যাইনি। সমুদ্রের ঢেউ দেখিনি, তার বিশালতা উপভোগ করিনি, শুধু টিভিতে দেখেছি। শুনেছি কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম শহর। ফলে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কর্ণফুলী নদীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও এই নদীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন-

-ওগো ও কর্ণফুলী

তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?

তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরূণী কে জানে,

'সাম্পান'-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?

আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান- ফুল গেল খুলি,

সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী?

আকাশ বলল চল, এবার আমরা সবাই বাস্তব তথ্য আর কল্পনার ভ্রমণ মিলিয়ে চট্টগ্রাম ঘুরতে যাব। রেল, সড়ক, আকাশপথ তিনভাবেই সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাবার ব্যবস্থা আছে। সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাবার ট্রেনগুলো হলো - উদয়ন এক্সপ্রেস এবং পাহাড়িকা এক্সপ্রেস। কল্পনার ট্রেনে চেপে তারা যাবে চট্টগ্রামে। সেখানে থাকে ইরার ছোট খালা। পঞ্চরত্নের চট্টগ্রামে বেড়ানোর আগ্রহের কথা শুনে ইরার ছোট খালা খুবই আনন্দের সাথে তাদের আমন্ত্রণ জানালেন। ছোটখালার মেয়ে ফাইজা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগে পড়ে। পঞ্চরত্ন আসছে শুনে ফাইজা আপু নিজে থেকে বলল, তাদের চট্টগ্রাম ঘুরে দেখাবে।

কর্ণফুলী নদী তীরের জনপদ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগ ১১টি জেলা নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম হলো পাহাড়, নদী, সমুদ্রের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র।

সিলেট থেকে সময়মতো কল্পনার ট্রেনে তারা চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে এসে পৌঁছাল। রেলস্টেশনে পঞ্চরত্নের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফাইজা আপু আর তার বন্ধু মেরি তঞ্চ্যঙ্গা। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী। তারা রেলস্টেশনে সবাইকে অর্ভ্যথনা জানাল। অবনী ফাইজা আপুকে বললেন, আমি একটা লেখাতে পড়েছিলাম চট্টগ্রাম রেলস্টেশনটি ব্রিটিশ সময়ে নির্মিত। কিন্তু এই রেলস্টেশনটাতো বর্তমান সময়ের স্থাপত্য শৈলিতে তৈরি। ফাইজা আপু হেসে উত্তর দিলেন তুমি ঠিক বলেছ, এটা নতুন ভবন। এর পাশেই রয়েছে সেই ব্রিটিশ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন সম্বলিত পুরনো স্টেশনটি। এবার তাহলে চল সেটা দেখে আসি।

স্থানীয় মানুষের কাছে এটা বটতলী রেলস্টেশন নামেও পরিচিত। বটতলী রেলস্টেশনে পৌঁছানোর পর ফাইজা আপু বললেন ভবনটি সংস্করণের পরে বর্তমানে এতে কার্যক্রম চলছে। লাল পাথরে তৈরি দ্বিতল ভবনটিতে মাঝখানে একটি এবং দুপাশে দুটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। শত বছরের বেশি প্রাচীন এই ভবনটি দেখলে তার জৌলুস বুঝা যায়।

স্টেশনের ভেতরে প্লাটফর্মে গিয়ে তারা অনেক রঙে রাঙানো একটা ট্রেন দেখতে পেল। সমীর ফাইজা আপুকে জিজ্ঞাসা করলেন এই সুন্দর ট্রেনটি কোথায় যায়? তিনি বললেন এইটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী শাটল ট্রেন। যেটাতে করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা চট্টগ্রাম শহর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যাতায়াত করি।

সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং

স্টেশন থেকে বের হয়ে তারা গেল উপমহাদেশের ব্রিটিশ সময়ের স্থাপনার অন্যতম নিদর্শন সি, আর, বি ভবন বা সেন্ট্রাল রেলওয়ে ভবনটি দেখতে। এটি চট্টগ্রাম মহানগরীর দৃষ্টিনন্দন প্রাচীন ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভবনটির সামনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটা মডেল রাখা আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই এলাকায় ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য শহিদদের নাম সম্বলিত একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সি, আর, বি এলাকাটি শতবর্ষীয় বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। এটি চট্টগ্রাম শহরের ফুসফুস নামে পরিচিত। চারদিকের ঘন সবুজ প্রকৃতির মাঝে লাল রঙের ভবনটি এক নান্দনিক স্থাপত্য নিদর্শন।

সি, আর, বি এলাকা পঞ্চরত্ন দেখতে পেল অনেক শিল্পশিক্ষার্থী বসে ছবি আঁকছে। কেউ আঁকছে গাছপালা আবার কেউ বা সি, আর, বি ভবনের ছবি। শিল্পশিক্ষার্থীরা পেনসিল স্কেচ, জলরংসহ অনেক মাধ্যমে ছবি আঁকছে। এই সকল শিল্প শিক্ষার্থীর বিষয়ে জানতে চাইলে মেরি আপু বললেন এরা সবাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনিস্টিটিউটের শিক্ষার্থী। যেহেতু চারুকলা ইনিস্টিটিউট এই এলাকা থেকে বেশি দূরে নয়, তাই শিক্ষার্থীরা এখানে তাদের আউটডোর অনুশীলনের জন্য আসে।

পঞ্চরত্ন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করল ফিরে গিয়ে তারা শিল্প ও সংস্কৃতির শিক্ষকের সহায়তায় ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে একদিন আউটডোর করবে। সেদিন তারা খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকবে, গান করবে, নাচ, অভিনয়সহ শিল্পকলার যেকোনো শাখায় ইচ্ছেমতো মনোভাব প্রকাশ করবে। সেদিন প্রকৃতি হবে তাদের পাঠশালা যেখান থেকে তারা আরো বেশি কিছু জানবে, শিখবে আর নিজের খুশিমতো প্রকাশ করবে।

সি, আর, বি এলাকা থেকে বের হয়ে তারা বাসায় পৌঁছাল। ফাইজা আপু বললেন আগামী দুই দিন ধরে আমরা চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপত্য নির্দশন ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখব এরপর যাব পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সবশেষে কক্সবাজার।

এরপর দুপুরে সবাই একসাথে খেতে বসল। ছোট খালা বললেন তোমাদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার রান্না করেছি। সমীরের জন্য রান্না করেছি কয়েক রকমের সমুদ্রের মাছ আর শুঁটকি। আর বাকিদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরুর মাংসের কালো ভুনা আর মেজবানির মাংস। আকাশ বলল তবে কি আমরা সমুদ্রের মাছ আর শুঁটকি খাব না? ছোট খালা হেসে বললতোমাদের সবার কথা বিবেচনায় রেখে আমি সব রকমের খাবার আয়োজন করেছি। তোরা যে যেটা খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিস সেটা নিয়ে খা।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফাইজা আপু বললেন এইবার প্রথমে আমরা যাব জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর দেখতে। সেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও জীবনজাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাব। সেই সাথে আরো কিছু দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ ও তাদের জীবন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারব।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় অবস্থিত জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরটি বাংলাদেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর। এই জাদঘরে বাংলাদেশসহ ৬টি দেশের প্রায় ২৫টি জাতিগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক সামগ্রীর প্রদর্শনীতে রয়েছে। এই জাদুঘর থেকে আমরা বাংলাদেশসহ ভারত, পাকিস্তান কিরগিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব। এই প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, চাক, রাখাইন, পাংখোয়া, সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া, মণিপুরী, পাঙন, (মুসলিম মণিপুরী), ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, দালু, মান্দাই, কোচ, রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরও, রাজবংশী, পলিয়া, যশোহর, ঝিনাইদহ অঞ্চলের বুনো, বা বোনা, বাগদি প্রভৃতিসহ পাকিস্তানের পাঠান, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কাফির, সোয়াত, ভারতের আদি, ফুওয়া, মুরিয়া, মিজো, কিরগিজিস্তানের কিরগিজ, অস্ট্রেলিয়ার অস্টাল এবং দুই জার্মানির মিলন প্রাচীরের ভগ্নাংশের কিছু নির্দশন জাদুঘরে প্রদর্শিত আছে।

জাদুঘরে তিনটি মানচিত্র ও ইতালির চিত্রশিল্পী মি. ক্যারোলির ১২টি দেওয়াল চিত্র আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীসহ পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর অলংকার, বাংলাদেশের পার্বত্যজেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠিদের বাসগৃহের নমুনা প্রদর্শিত আছে।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা লাভ করল।

জাদুঘর থেকে পঞ্চরত্ন গেল ১৬৬৭ সালে মোঘল স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী নির্মিত আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ দেখতে। তারপর একে একে তারা দেখল ৩০০-৩৫০ বছর পূর্বে শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী দেবীর মন্দির, দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় অবস্থিত ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্গত ক্যাথিড্রাল, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সহযোদ্ধা বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মৃতি জড়িত স্থান ইউরোপিয়ান ক্লাব পরিদর্শনে।

তাছাড়া তারা স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে জব্বারের বলীখেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানল।

জব্বারের বলীখেলা

চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে প্রতিবছরের ১২ই বৈশাখ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় কুস্তি প্রতিযোগিতা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তা বলীখেলা নামে পরিচিত। ১৯০৯ সালে এই বলীখেলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম নগরের বদরপাতি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত আবদুল জব্বার সওদাগর।

বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ এবং একই সঙ্গে বাঙালি যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা ছিল এই বলীখেলার মূল উদ্দেশ্যে। জব্বার মিয়ার বলী খেলা ও বৈশাখী মেলা চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অহংকারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় লোকজ উৎসব হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হয়।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর তারা এসে পৌঁছাল কর্ণফুলী নদীর পাড়ে। চট্টগ্রাম শহর, কর্ণফুলী নদী আর সাম্পান এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যুগে যুগে কত গল্প, গান, লোকগাথা, নাটক, যাত্রা রচিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির একটি নান্দনিক দিক রচিত হয়েছে কর্ণফুলী নদীকে কেন্দ্র করে। কথাগুলো বলছিলেন ফাইজা আপু আর মেরি আপু।

তারা আরও বলেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব এবং শেফালী ঘোষকে বলা হয় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের রাজা-রানী। তাছাড়া আস্কর আলী পণ্ডিত, খায়েরুজ্জামান পণ্ডিত, রমেশ শীল, আবদুল গফুর হালীসহ প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের গানকে করেছেন সম্মৃদ্ধ। মাইজভাণ্ডারী গান ও কবিয়াল গান চট্টগ্রামের অন্যতম ঐতিহ্য। কবিয়াল রমেশ শীল এই ধারার একজন কিংবদন্তি শিল্পী ছিলেন। এইসব গানের মধ্যদিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নাসহ সমগ্র জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে।

চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী গানের মধ্য দিয়ে আধ্যত্মবাদ এবং মানবপ্রেমের রূপ ফুটে উঠেছে। চট্টগ্রাম কবিগানের জন্য উপমহাদেশে বিখ্যাত স্থান। নীতিকথা, মানবতা, রাজনীতি সবকিছু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ফুটে উঠেছে এই অঞ্চলের কবিগানে। এইভাবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিকগান হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের গান। মলয় ঘোষ দস্তিদার রচিত এবং শেফালী ঘোষের গাওয়া তেমনি একটি জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান হলো—

‘ছোড ছোড ঢেউ তুলি ফানি।।
লুসাই পাহাড়ত্তুন লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলী।’

শেষ বিকেলের আলোতে কর্ণফুলী নদীটাকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। অনেক জাহাজ আর সাম্পান ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর বুকে। একপাশে হালকা ভাবে দেখা যাচ্ছে শাহ আমানত সেতু আর অন্যপাশে নদীর মোহনায় চট্টগ্রাম বন্দরের অংশবিশেষ। চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে দেখিয়ে ফাইজা আপু বললেন এই সেই চট্টগ্রাম বন্দর যেখানে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা পরিচালিত করেছিল অপারেশন জ্যাকপট। অপারেশন জ্যাকপট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের এক বিশাল সফলতার নাম। এটি ছিল একটি আত্মঘাতী গেরিলা অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম অভিযানটি ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নামে পরিচিত। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬ টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়। এই অপারেশন হানাদারদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ‘অপারেশন জ্যাকপট’ সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের এই ইতিহাস শুনছিল পঞ্চরত্ন।

পশ্চিম আকাশটাকে রক্তিম করে দিয়ে দিনের শেষ সূর্যটা ডুবে গেল। আকাশ দ্রুত তার বন্ধুখাতায় কর্ণফুলী নদীর সে মায়াবী দৃশ্যটির একটা খসড়া এঁকে রাখার চেষ্টা করল। কর্ণফুলী নদীর জন্য বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তারা সেদিনের মতো ঘরে ফিরে চলল। ঘরে ফেরার পথে মেরি আপু পঞ্চরত্নকে বললেন তোমাদেরকে চট্টগ্রামের লোক সংগীতের একজন শিল্পীর কথা বলি। যিনি তাঁর ঢোল বাদনের জন্য সমগ্র দেশে বিখ্যাত ছিলেন তিনি হলেন বিনয় বাঁশি জলদাস।

বিনয় বাঁশি জলদাস। নামে তাঁর বাঁশি থাকলেও তিনি কিন্তু বাজাতেন ঢোল। ঢোল বাংলার নিজস্ব তাল বাদ্যযন্ত্র। আবহমান কাল ধরে বাংলার লোকজ সংস্কৃতির সাথে ঢোলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ঢোলের ব্যবহার আজও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে প্রবাদ প্রতিম ঢোলবাদক হলেন বিনয় বাঁশি, তাঁর জন্ম ১৯১১ সালে বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ব গোমদণ্ডী গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি পারিবারিক পেশা ঢোল বাজানোর তালিম নেন। ঢোল বাদনের হাতেখড়ি তাঁর বাবা উপেন্দ্রলাল জলদাসের কাছে। ছেলেবেলাতে তিনি যাত্রার গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন সময়ে তিনি যাত্রাদলে, ঘেটু গানের দলে, কীর্তন, শরীয়তি, মারফতি গানের দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি ঢাকি নৃত্যশিল্পী হিসেবে দক্ষতা লাভ করেন। এক যাত্রাদলে কাজ করার সময় তাঁর পরিচয় হয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ শীলের সাথে। বিনয় বাঁশির ঢোল বাদন শুনে রমেশ শীল তাঁকে নিজ দলে নিয়ে নেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর রমেশ শীলের দলে কখনও দোহার কখনও ঢুলি হয়ে বিনয় বাঁশী যুক্ত ছিলেন। রমেশ শীলের শেষ দিন পর্যন্ত বিনয় বাঁশী তাঁর দলের প্রধান বায়েন ছিলেন। ঢাকার কার্জন হলের সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কলকাতার মহাম্মদ আলী পার্কের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদয় শংকর, শেখ গুমানি, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সলিল চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৪ সালে নৃত্যচার্য উদয় শংকরের দলে কিছুদিন কাজ করেন। বিনয় বাঁশি তাঁর সারা জীবন কাটান ঢোল বাজিয়ে, ঢোল বাদনের শৈলিকে তিনি নিয়ে যান অনন্য মাত্রায়। যন্ত্রসংগীতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ২০০১ সালে তিনি ২১শে পদকে ভূষিত হন। ২০০২ সালে তিনি মারা যান।

পরের দিন তারা মেরি আপুর সাথে রাঙ্গামাটির উদ্দেশে রওনা দিল। বাসে যেতে যেতে মেরি আপু তাদের জানাল বাংলাদেশের তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। জেলাগুলো হলো- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।

এই তিনটি জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি। তাছাড়া এই অঞ্চলে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীও বসবাস করে। পাহাড়ে বসবাসকারী প্রতিটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। সবুজ পাহাড়ে বসবাসকারী এই সকল মানুষের বর্ণিল সংস্কৃতি আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

এরমধ্যে আকাশ মেরি আপুকে জিজ্ঞাসা করল শুনেছি তাঁতশিল্পে পার্বত্য জেলার বুনন শিল্পীদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও করণকৌশল? মেরি আপু বললেন তুমি ঠিক শুনেছ। আমরা প্রথমে রাঙ্গামাটির যে এলাকায় যাব তা পাহাড়ি তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রাঙ্গামাটির লেকের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা চলে এলো আসাম বস্তি নামক জায়গায়। এইখানে তারা তাঁতের শিল্পের কারখানা, বুননসহ সব কিছু দেখল। এই এলাকায় রয়েছে অনেক বিক্রয় কেন্দ্র। সেগুলোও তারা ভাল করে দেখল এবং ডিজাইনগুলো এঁকে নিল বন্ধুখাতায়। চেক, স্ট্রাইপ এর সাথে চমৎকার মোটিফের ব্যবহার এই এলাকার বুননকে করেছে আলাদা। এই এলাকার স্থানীয় বুনন শিল্পীরা মূলত কোমর তাঁতে কাপড় বুনে। পঞ্চরত্ন বলল শতরঞ্জি বুনতে আমরা দেখেছিলাম গর্ত তাঁতের ব্যবহার এখানে দেখছি কোমর তাঁতের ব্যবহার। মেরি আপু বললেন এই এলাকের কিছু মানুষ এখনও নিজেরা তুলা থেকে সুতা তৈরি করে প্রাকৃতিকভাবে তা রং করে কাপড় তৈরি করে। প্রাকৃতিকভাবে রং করাকে ইংরেজিতে বলা হয় (organic dye) যা কিনা বর্তমান বিশ্বে খুবই সমাদৃত।

কোমর তাঁত

কোমর তাঁতে বুনা কাপড়ের নকশা

সেখান থেকে তারা গেল রাঙ্গামাটি শহরের ভেদভেদি নামক স্থানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট ও জাদুঘরটি দেখতে। এখানে তারা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলো। এরপর তারা আমন্ত্রিত অথিতি হিসেবে মেরি আপুর বাসায় তঞ্চদের ঐতিহ্যবাহী খাবার খেল। সেখানে মেরি আপুর বাবা বললেন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে জুম চাষ এবং তাকে কেন্দ্রকরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। তাই আমাদের নাচ, গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজে জুমের বিষয়টি ফুটে ওঠে। তিনি আরও বললেন আমরা পাহাড়ে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করি। বিজু, বৈসু, সাংগ্রাইন, চাঃক্রান পোই সহ প্রভৃতি উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বছরকে বরণ করি। তাছাড়া পাহাড়ে বসবাসকরা প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ। এরপর মেরি আপুর ছোটবোন তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী তঞ্চঙ্গা নাচের ভঙ্গিসহ একটা গান গেয়ে শুনালেন। সেখান থেকে তারা রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে রাঙামাটি থেকে বিদায় নিল। ফিরে আসার সময় বাসের স্পিকারে বেজে উঠল মনিরুজ্জামান মনিরের লিখা, আলাউদ্দিন আলীর সুর করা আর নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী গাওয়া গান—

রাঙ্গামাটির রঙে চোখ জুড়ালো
সাম্পান মাঝির গানে মন ভরালো
রূপের মধু সুরের জাদু কোন সে দেশে
মায়াবতী মধুমতি বাংলাদেশে

রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে এসে পরেরদিন ভোরে তারা যাত্রা করল পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের উদ্দেশ্য। সেখানে পৌঁছে সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার পথে তাদের চোখে পড়ল সারি সারি দোকান। এইসব দোকানে বিক্রি হচ্ছে হরেক রকমের শামুক-ঝিনুকে তৈরি করা হস্তশিল্প সামগ্রী। গৃহসজ্জার সামগ্রী থেকে শুরু করে কলমদানি, ল্যাম্পশেড, নানারকমের খেলনা, চাবির রিংসহ নানা রকমের গহনা। ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতি আর রঙের শামুক-ঝিনুক কেটে জোড়া লাগিয়ে এইসব হস্ত ও কুটিরশিল্প সামগ্রীগুলো তৈরি করা হয়েছে। এসব শিল্পসামগ্রী দেখতে দেখতে অবনী বলল আমরা ফিরে গিয়ে গহনা তৈরির একটা উদ্যোগ নিতে পারি। আকাশ বলল কিভাবে হবে সেটা? অবনী বলল-

এই পাঠে আমরা যা করব

আমাদের উদ্যোগটির নাম হবে ‘গয়না-মালা বানাই’। কাজটি আমরা দলগতভাবে করব। এই কাজটি করতে অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে না শুধু একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িতে পরে থাকা অপ্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, মোটা কাগজ। মোটা কাগজ আমরা পুরান খাতার মলাট/ মিষ্টির প্যাকেট থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

- কাগজটিকে পছন্দমতো লকেট/center pice আকৃতিতে কেটে নেব।
- লকেট আকৃতির কাগজটি কাপড় দিয়ে মুড়ে সেলাই করে নিতে হবে, চাইলে আমরা নিখুঁতভাবে আঠা দিয়েও কাপড়টা কগজের উপর লাগাতে পারি।
- কাগজের উপর কাপড়টি লাগানো শেষ হলে লকেটটির উপরে রং দিয়ে বিভিন্ন রকমের নকশা করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন সহজলভ্য প্রাকৃতিক জিনিস যেমন- শুকনো পাতা, ফুল, বিভিন্ন রঙের বীজ, কড়ি,

ঝিনুক ইত্যাদি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নকশা করতে পারি। কেউ চাইলে চুমকি/পুতি/আয়না ও লাগাতে পারি।

- এবার লকেটটি ঝুলানোর জন্য দুইপাশে কাপড়ের ফিতা লাগাতে হবে। ফিতাটিও আগে সেলাই করে নিতে হবে। চাইলে কাপড়ের ফিতার পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের সুতাকে বেনির মতো পাকিয়ে তার সাথে লকেটটি জুড়ে দিতে পারি।

এসব পরিকল্পনা করতে করতে তারা সমুদ্র সৈকতে এসে পৌঁছাল। সমুদ্রের ঢেউ যেন ছন্দ তুলে তাদেরকে বরণ করে নিল। সমুদ্রের শব্দ যেন বারবার ফিরে এসে সুরের মূর্ছনা তৈরি করছে। অবনী বলল প্রকৃতি যেন এক একটি স্বর মিলিয়ে মিলিয়ে সুরের মালা গাঁথছে। সমীর বলল স্বর দিয়ে সুরের মালা তৈরি করতে কিন্তু সাতটি শুদ্ধ স্বরের সাথে পাঁচটি কোমল ও কড়ি স্বরও প্রয়োজন হয়। স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বরকে বলা হয় শুদ্ধ স্বর। তবে র, গ, ধ, এবং ন এই চারটি স্বরের সাথে আরও একটি করে কোমল স্বর রয়েছে। কোমল স্বরগুলো লেখারও নিয়ম রয়েছে। যেমন- র কে লেখা হয়- ঋ, গ কে- জ্ঞ, ধ কে দ, ন কে ণ। এই চারটি স্বর ছাড়াও 'ম' স্বরের সাথে একটি সহস্বর আছে যাকে বলা হয় 'কড়ি' স্বর। শুদ্ধ ম স্বরের থেকে এই স্বরটির অবস্থান একটু চড়া বা উপরে হওয়ার কারণে এটিকে কড়ি ম বলা হয়। তখন ম স্বরকে লেখা হয় হ্ম এর মতো। শুদ্ধ স্বরে যেভাবে আরোহন এবং অবরোহন করা হয়, ঠিক একইভাবে কোমল কিংবা কড়ি স্বরেও আরোহন অবরোহন চর্চা করতে হয়। যেমন-

ঋ- স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চা

আরোহন- স ঋ গ ম প ধ ন র্স

অবরোহন- র্স ন ধ প ম গ ঋ স

এভাবে সাতটি শুদ্ধ স্বরের সাথে পাঁচটি কোমল ও কড়ি স্বর মোট বারটি স্বর মিলিয়ে তৈরি হয় সুরের মালা। অবনী বলল শামুক-ঝিনুকের মালা থেকে সুরের মালা কেমন যেন সবকিছু মিলেমিশে এক হয়ে গেল। আকাশ বলল বাংলাদেশের মানচিত্রের সবচেয়ে উপরের অংশের সাথে সবচেয়ে নিচের অংশের মালা গাঁথাটা আজকে আমারা সম্পন্ন করলাম। নদীমাতৃক এই দেশের আটটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আটটি জনপদের শিল্প ও সংস্কৃতির মুক্তা দিয়ে আমরা যে মালা রচনা করেছি তাঁর নাম বাংলাদেশ। সমুদ্রসৈকতে কিছু নবীন শিল্পীদের গাওয়া গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছিল। মলয় ঘোষ দস্তিদারের লিখা চট্টগ্রামের জনপ্রিয় সে আঞ্চলিক গানের কথাটি পঞ্চরত্নের মনের কথার সাথে মিলে গেল—

বাংলাদেশের যতো কবি
শিল্পী গায়ক আছে...
শুভেচ্ছা জানাই আঁরা
অক্কল গুনর হাছে

চাটগাঁইয়া হতাত সুরে
গান হুনাই গেলাম...

দইজ্যার কুলত বসত গরি
সিনা দি ঠেগাই ঝড় তুয়ান।

ও ভাই আঁরা চাটগাঁইয়া নওজোয়ান

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- এই অধ্যায়ে দেওয়া গয়না-মালা বানাই কাজটি প্রত্যেকটি ধাপ সম্পন্ন করে নিজেদের ইচ্ছামত গয়না-মালা তৈরি করব।
- ঋ- স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চাটি যথাযথ ভাবে করব।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।
- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।
- শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে ক্লাসের সব বন্ধুরা একত্রিত হয়ে একদিন আউটডোর করব। সেদিন খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকব, গান করব, নাচ, অভিনয়সহ শিল্পকলার যেকোন শাখায় ইচ্ছেমতো মনেরভাব প্রকাশ করব।
- বিনয় বাঁশি জলদাস এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।